Vol. 31 | No. 3 | 198

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সোমেন চন্দ : জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যভাবনা

Volume	31
Issue	3
Year	198
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	June 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i3.7
Pages	191-208
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সোমেন চন্দ : জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যভাবনা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

কোন মহৎ প্রতিভাই স্বয়ম্ভূ বা একক নয়, সময়-সমাজ-ইতিহাস ও সভ্যতার শক্তি ও সত্য আত্মীকরণ করেই তার সৃষ্টি ও বিকাশ। সৃষ্টিশীল প্রতিভা বস্তুজগৎ-নিরপেক্ষ কিংবা দেশ-কাল বিবিক্ত হতে পারেনা ; শিল্পীর জীবনভাবনা এবং শিল্পচেতনা অনিবার্যভাবে সমকালের দ্বান্দ্বিক ও বিবর্তন-চঞ্চল সমাজসত্তায় লালিত-বর্ধিত। তবে জীবনবীক্ষণের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে, সমাজবিন্যাসের ব্যতিক্রমী অভীপ্সায় এবং মানবিক অস্তিত্ব-উপলব্ধির প্রাতিস্বিক বাসনায় মহৎ শিল্পীরা হয়ে ওঠেন একক, স্বয়ংস্বতন্ত্র, ব্যতিক্রমধর্ম-চিহ্নিত ; স্বকাল-লগ্ন হয়েও কখনো যুগোত্তীর্ণ, কখনো-বা স্বপ্ন-সম্ভাবনায় ঋদ্ধ আসন্ন কালের পথিকৃৎ-ভাষ্যকার। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উজ্জ্বল এবং ব্যতিক্রমী নাম সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) এমনি কাললগ্ন থেকেই হয়ে উঠেছেন কালোত্তীর্ণ, জীবনবীক্ষণ ও শিল্প-অন্বেষায় নতুন ধারার প্রবর্তক।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশ-চল্লিশের দশকের সমাজ ও সময়ের বিসর্পিল বিকাশ, সভ্যতার সংকট ও অন্তঃসারকে স্বীকরণ করে সোমেন চন্দের জীবন-বোধ ও শিল্পাদর্শ অর্জন করেছিল এক গৌরবময় ও প্রাতিস্বিক মাত্রা। মাত্র বাইশ বছরের একটি জীবন[১] একজন মহৎ শিল্পীর জগৎ-ভাবনা ও শিল্পবোধের পূর্ণ পরিচয় হয়তো তুলে ধরতে পারেনি, অপূর্ণ থেকেছে বিকাশের পরম স্তর—তবু পদ্মপাতার শিশিরে যেমন হেসে ওঠে প্রভাতের সম্পূর্ণ সূর্য, তেমনি ওই স্বল্প-পরিসর জীবন থেকেই বোঝা যায় সোমেন-মানসের পূর্ণ-স্বরূপ, তাঁর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। বাল্যের দারিদ্র্য-অভিজ্ঞতা, স্বদেশী-আন্দোলনের প্রতি পিতার সমর্থন, সন্ত্রাসবাদী কর্মীদের সঙ্গে পরিচয়, প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রেরণায় গণসাহিত্য রচনায় উৎসাহ, শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্যপদ লাভ, মার্কসবাদে দীক্ষা, ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে ফ্যাসিস্টশক্তির আক্রমণে গৌরব-দীপ্র

মৃত্যু— বেড়ে-ওঠার এই ক্রম-ইতিহাস বিবেচনার মধ্য দিয়েই সোমেন চন্দের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যভাবনার স্বরূপ নির্মাণ সম্ভব।

সোমেন চন্দ জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমকালীন সাহিত্যিকরা দুই বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে পড়ে জীবনের শুভ্রতা আর স্বস্তির পরিবর্তে অঙ্কন করেছেন কেবল গ্লানি আর অন্ধকার—জীবনে তাঁরা খুঁজে পাননি আশার আলো। বিপন্ন এই সমাজ-প্রতিবেশে দাঁড়িয়েও সদ্য কৈশোর-অতিক্রান্ত এক যুবক জীবনকে দেখেছেন অনিমেষ আলোর দৃষ্টি দিয়ে—শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি সাঁতার কেটেছেন জীবন-জয়ের মহাসাগরে। কারখানার শ্রমিকদের তিনি শোনাতেন এই জীবনের গান, জীবনকে সুন্দর করে নির্মাণ করবার জন্য সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান। বস্তুত, জীবনকে জানাই ছিল সোমেনের প্রধান ব্রত। তিনি জানতে চেয়েছেন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে, তবে প্রগাঢ় আস্থা রেখেছেন সেই জীবনে, যে-জীবন ইতিহাসের সড়ক নির্মাণে এগিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সমালোচকের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> ডাক্তারী পড়ার চেয়ে (সোমেনের) অধিক আগ্রহ মানুষের জীবনকে জানার, ইতিহাসের ঠিকানাকে উপলব্ধি করার। ... ইতিহাসের জটিল যুগসন্ধিক্ষণে সেই বাইশ বছরের যুবক সোমেন আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিভ্রান্তির সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে আগামীর দিকে তাকিয়েছেন। ইতিহাসের সড়ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয়না। তাকে তৈরী করতে হয়। ইতিহাসের সেই সড়ক তৈরীতে সোমেন নিজের হাত লাগিয়েছেন এবং মানুষের জন্য সুন্দরতর সমাজ গড়ার কামনায় সেই ইতিহাসের সড়কে নিজের জীবন দান করেছেন।[২]

বৈরী সময়ের পটভূমিতেও সোমেন চন্দ জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণে দেখতে পেরেছেন, কারণ তাঁর পা ছিল মাটিতে, আর জীবনকে জানার ইচ্ছা ছিল তাঁর উদগ্র। ব্যাপক গণজীবনের সঙ্গে ছিল তাঁর সহজ আত্মীয়তা। গ্রামবাংলার মানুষকে তিনি দেখেছেন গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে। রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে তিনি গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনসংগ্রামকে। হতাশাকে দূর করার জন্য, বৈরী সময়কে অতিক্রম করার জন্য তিনি সর্বদা থেকেছেন মাটি আর মানুষের কাছাকাছি, পেয়েছেন

সেখান থেকে অন্ধকার কাটিয়ে যাবার অন্তহীন অনুপ্রেরণা। তাঁর একাধিক গল্পে, যে-গুলো তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা, আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাবো। 'স্বপ্ন', 'গান,' 'সংকেত', 'সত্যবতীর বিদায়', 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন' প্রভৃতি গল্প এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এসব গল্প তাঁর মানস-অভীপ্সা, জীবনার্থ এবং শিল্পভাবনার চারিত্রনির্দেশক।

মধ্যবিত্তের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা সোমেন চন্দ সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সময়ের পচনশীলতায় যখন বাঙালীসমাজ আক্রান্ত, তখন সোমেন চন্দ দূর করতে চেয়েছেন সেই পচন-উৎসকে। জীবনের জন্য, সমাজের জন্য কল্যাণচিন্তাই তাঁকে জনজীবনমূল-সংলগ্ন করেছে। এক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী এবং ক্রম-রিক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর তিনি আস্থা স্থাপন করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীর মতো, তাঁর চোখে ধরা পড়েছে মধ্য-বিত্তজীবনের সামূহিক সত্য—"আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে অনিবার্য্য-ভাবে পচন ধরেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বুদ্ধিজীবী সমাজেই —অর্থাৎ যাঁরা প্রগতি-পরায়ণ লেখক তাঁরাও বাদ যান না,—সবার ভেতরেই পচন ধরেছে। এরা বলেন অনেক, জানিনা কিছুই বিশ্বাস করেন কি না। ....কিন্তু জানেন এই মধ্যবিত্ত সমাজেরই ভেতর থেকে একদল যাবে নীচে নেমে; তাদেরই ভেতর থেকে আগামী দিনের বিপ্লবের পুরোহিতরা বেরিয়ে আসবেন।"[৩] পচনশীল মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে, এভাবে, ইতিবাচক জীবন-দৃষ্টির সন্ধানী আলো ফেলে তিনি বের করে নিয়ে আসেন আগামী দিনের বিপ্লবের পুরোহিত। এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'ইঁদুর' এবং 'একটি রাত' গল্পদ্বয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেখানে দেখা যাবে, নায়ক সুকুমার (উভয় গল্পের নায়কের নামই সুকুমার, বস্তুত সুকুমার সোমেন চন্দের আত্ম-প্রতিকৃতি) মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সমাজ-বদলের সংগ্রামে সামিল হয়েছে। 'ইঁদুর' গল্পের নায়ক বলছে:

> আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি আমার চমৎকার লেগে-ছিল। আমার এই মধ্যাহ্নের ট্রাক্টর-স্বপ্নের ভিৎ পাকা করতে আরম্ভ করলাম সেদিন থেকে। একথা বলাই বাহুল্য যে ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলাম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলাম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলাম। তাদেরো ধন্যবাদ, যারা আমাকে

আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।...

আমি ফিরে এলাম। সাম্যবাদের গর্ব, আর ইস্পাতের মতো আশা, আর সোনার মতো ফসল বুকে করে ফিরে এলাম।[৪]

'একটি রাত' গল্পের নায়ক সুকুমার মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা আর অস্তিত্বের মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয় গোর্কির 'মা' উপন্যাসের পাভেল-সত্তায়; বিপ্লবস্পন্দিত বুকে নিজের মা-র মধ্যে আবিষ্কার করে গোর্কির পেলগায়া নিলভানা ভ্লাসভাকে—

হা-হা করে হেসে সুকুমার বললে, 'দেখুন মা কেমন রেগেছে!' সামসুর তার হল্‌দে দাঁতগুলি বের করে হাসলে।

সুরেন মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আমাদের কিছু দোষ নেই, মা!' মা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'উহুঁ তোমাদের কিছু দোষ নেই, তোমরা সব শান্ত সুবোধ বালক!' তারপর সুকুমারের দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোরা মনে করিস আমি কিছুই বুঝিনে কিন্তু আমি সব বুঝি।'

এই শুনে সকলেই হেসে উঠলো। সুরেনের গলাটাই শোনা যায় সবচেয়ে বেশী। সে আস্তে কথা বলতে পারে না। যত বাজে বা হাস্যকর কথাই হোক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে সে কথা বলবে। জামার বোতাম তার কোন কালেই থাকেনা। তবু বোতাম লাগানোর বৃথা চেষ্টা করতে করতে সে বললে, 'কী বোঝেন, বলুন, আমরা সবাই শুনি।'

মা তার দিকে একদৃষ্টে চাইলো, এই মধুর স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় মুখের কাঠিন্য চেষ্টা করলো দূর করতে, কিন্তু চেষ্টা করেও যেন পারলোনা।'

সুকুমার বলল, 'বুঝবে না! আপনারা পাভেলকে জানেন?'

—'পাভেল'?

—'সে কী, গোর্কির 'মা' পড়েননি?'

'হুঁ, পড়েছি, পড়েছি।'

—'ইনিও সেই পাভেলের মা, সেই মা!' সুকুমার মা'র দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।[৫]

মার্কসবাদী জীবনদৃষ্টিই সোমেন চন্দকে সমকালীন সাহিত্যিক-পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট করে তুলেছে। একজন মার্কসবাদী কর্মী ও সংগঠকের জীবনবোধই তাঁর জীবনদৃষ্টির মৌল-বৈশিষ্ট্য। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোয় তিনি জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন; বিচার আর বিবেচনায় সর্বদা প্রয়োগ করেছেন দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব। বস্তুত কমিউনিস্ট পার্টি'র সঙ্গে সম্পৃক্তি ও মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস সোমেনের বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এই বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে তাঁকে দিয়েছে কালোত্তীর্ণ মহিমা। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সোমেনের কর্মকাণ্ড তাঁর জীবনদৃষ্টিতে নিয়ে এসেছে বৈশ্বিক মাত্রা। বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী চিন্তার প্রকাশ সোমেনের সাহিত্যেই প্রথম সচেতনভাবে এসেছে। চল্লিশের দশকে এ-ধারায় অনেক কবি-সাহিত্যিক আবির্ভূত হলেও সোমেন তিরিশের দশকের শেষদিকেই সাম্যবাদী জীবনদৃষ্টি নিয়ে এসেছেন আমাদের সাহিত্যে। যে-বিশ্বাসে তিনি রেভল্যুশনের সময় ভ্যানগার্ডে থাকতে চেয়েছেন,[৬] সেই বিশ্বাসই তাঁর জীবনার্থের নিয়ন্ত্রক-শক্তি। বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ-প্রতিষ্ঠাই সোমেনের জীবনের স্বপ্ন— সোমেনের সকল কর্মের পশ্চাতেই আমরা তাঁর এই বিশ্বাসকে আবিষ্কার করতে পারবো। বস্তুত, মার্কসীয় দর্শনই তার জীবন ও সাহিত্যকর্মের মৌল নিয়ামক-শক্তি এবং এটাই তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বতন্ত্র মাত্রা-নির্দেশক।

ব্যাপক অভিজ্ঞতাই ছিল জীবনসম্পর্কে সোমেনের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের অন্যতম সহায়কশক্তি। আত্মমুখী এই শিল্পী সংবেদনশীল অন্তর দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন—পূর্ণ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতালোক। তিনি যথার্থ-ভাবেই উপলব্ধি করেছেন—"প্রোলেটারিয়েট পার্টি'র শক্তির উৎস। এযুগের রাজনৈতিক পালাবদলে প্রোলেটারিয়েটের ভূমিকাই অগ্রণী। তাদের মধ্যে যদি কাজ করতে না পারলাম, তবে শৌখীন কমিউনিস্ট বলে নাম কিনে লাভ কি?"[৭] শ্রমিকজীবনকে ভালোভাবে জানার জন্য তিনি ঢাকা শহর ছেড়ে নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক বস্তিতে সার্বক্ষণিক ভাবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি'র কাছে। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে, প্রগতি লেখক সঙ্ঘকে সচল রাখার প্রয়োজনে তাঁর সে-ইচ্ছা অপূর্ণ থেকেছে, তবু

ঐ আকাঙক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁর মানস-প্রবণতা অনুধাবন করা সম্ভব। ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি তাঁর ভাবনাকে বার বার পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন এবং সকল সংশয় কাটিয়ে একটি দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ মীমাংসায় পেঁৗছাতে চেয়েছেন। এভাবে, অতি অল্প সময়ে, মাত্র বাইশ বছরের মধ্যেই, তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখার বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাই, ১৯৩৮ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার, তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন এইকথা—"গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর—এমন কি, যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতোগুলো sweet উপন্যাস রচনা করেছেন বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত আমি, কিন্তু এতদিন সে-সব সম্বন্ধে কিছু লিখিনি এই ভেবে যে, ওসব পুরনো হয়ে গেছে, এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার। কিন্তু বছরখানেক সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পথই খুঁজে পেতাম না, এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে...।"[৮] সোমেনের অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু রণেশ দাশগুপ্তের কথাও এখানে স্মরণীয়—

> গ্রামবাংলার মানুষকে সোমেন চন্দ খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। ঢাকা শহরে পড়ালেখা করলেও সোমেন চন্দ ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে আসতেন গ্রামে। সেখানে তিনি দেখে-ছিলেন গ্রামের সমস্ত স্তরের মানুষকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তিনি তাঁর 'স্বপ্ন' এবং 'গান' নামক দু'টি গল্পে যে সব ছবি এঁকেছেন, তাতে মনে হয় বাংলার গ্রামকে তিনি বুঝিবা নখাগ্রে ধারণ করে-ছিলেন। ১৯৪০ সনে যখন তিনি ঢাকা শহরে রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে নামেন একজন কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে, তখনও গভীরভাবে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেলেন শ্রমিক জীবনের। তিনি দেখলেন, শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর চেনা গ্রামীণ মানুষের মর্মরূপটিকে যা তখন কৃষি থেকে শিল্পে এসে ঢালাই হতে শুরু করেছে পরিবর্তনের ছাঁচে। ...'সংকেত' গল্পটিতে রয়েছে এর পরিচয়।[৯]

অসাম্প্রদায়িক মানসপ্রবণতা সোমেন চন্দের জীবনদৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট— তাই তথাকথিত ধর্মচিন্তা থেকে তিনি প্রথম থেকেই মুক্ত। প্রথাবদ্ধ ধর্ম নয়, মানুষের ধর্মই ছিল তাঁর কাছে প্রধান আচর-ণীয় বিষয়। ছাত্রজীবনে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পৃক্তি, প্রগতি লেখক

সংঘের সঙ্গে সংযুক্তি ও মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাস সোমেন চন্দকে তিরিশ-চল্লিশের দশকের সংকীর্ণ ধর্মচিন্তা থেকে দূরে রেখেছিল। মানুষের সংকীর্ণতায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও দাঙ্গা তাঁর চিত্ত-তলে তুলেছে প্রবল আলোড়ন। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে ঢাকার দাঙ্গা প্রতিরোধে সোমেন পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁর 'দাঙ্গা' গল্পটি এ-সূত্রে স্মরণীয়। এ-প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন—"স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রামে নিয়োজিত তাদের মধ্যে কেউ পাছে সাম্প্রদায়িক বিষ খেয়ে বসে, এনিয়ে সোমেনের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলনা। 'দাঙ্গা' গল্পটি এই উৎকণ্ঠার ফল। নিজেকেও তিনি তাঁর গল্পের বাইরে রাখেননি। তিনি যে সাইকেলে চড়ে দাঙ্গাদুর্গত শহরে ঘুরে বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ নিতেন, তার মধ্য দিয়েই সরেজমিনে দাঙ্গার চেহারাটাকে দেখেছিলেন। নায়ককেও এই সূত্রে আমরা সাইকেল আরোহীর চেহারায় পাই।"[১০] 'দাঙ্গা'-র নায়ক অশোকের বক্তব্যে যে সংগ্রামী জীবনভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, বস্তুত তা সোমেন চন্দের আত্মজৈবনিক উচ্চারণ :

> অশোকের মা খালি মাটিতে ভয়ানক ঘুমুচ্ছিলেন, ছেলের ডাকে ঘুম থেকে উঠে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'যা শিগ্‌গির, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি! একশোবার বলেছি যে, যা বাপু মামাবাড়ী কিছুদিন ঘুরে আয়, মারামারিটা কিছু থামলে পরে আসিস, না তবু এখানে পড়ে থাকা চাই, একটা ছেলেও যদি কথা শোনে! মাটি কামড়ে পড়ে থাকা চাই, শহরের মাটি এমন মিষ্টি, না ?'
>
> অশোক হেসে বললে, 'এত কাজ ফেলে কোথায় যাই বলো ?'
>
> —'হুঁ কাজ না ছাই! কাজের আর অন্ত নেই কী না। তোদের কথা শুনবে কে রে ? কেউ না। বুঝতে পেরেছি তোদের কতখানি জোর, কেবল মুখেই পট্‌পটি, হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা!'
>
> —'জানো কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় কানপুরে কী হয়েছিল ? আমরা দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছিলুম।'
>
> মা দুই হাত তুলে বললেন, 'হয়েছে। অমন ঢের বড় বড় কথা শুনেছি। তোদের রাশিয়ার কী হলো শুনি ? পারবে জার্মানীর সঙ্গে ? পারবে ?'

অশোক বাইরের দিকে চেয়ে বললে, 'পারবে না কেন মা ? বিপ্লবের কখনো মরণ হয় ?'[১১]

শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্তির ফলে সোমেন চন্দের রচনায় এসেছে গৌরবময় এবং যুগান্তকারী মাত্রা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রমিক আন্দোলনের চিত্র-উপস্থাপনায় সোমেনের অবদান অবিস্মরণীয়। শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে গভীরতর একাত্মতা সোমেন-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, শ্রমিকশ্রেণীকে ভালোবাসার দাবী মিটাতে, শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় তাঁর রচনায় এসেছে এই প্রতিজ্ঞা—''মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, 'আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি, তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে।... সেজন্য আমার গর্বের সীমা নেই। আমি জানি, আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে, প্রতি-ক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম, আমার কোন ভয় নেই।'''[১২] গল্পের নায়ক অশোকের জবানীতে এ-কথা, বস্তুত, সোমেনেরই আন্তরিক উচ্চারণ।

ফ্যাসিবাদের বি-মানবিকতার থাবা থেকে মানবজাতির মুক্তিকামনা সোমেন চন্দের জীবনদৃষ্টির উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। তিরিশ-চল্লিশের দশকে হিটলার-মুসোলিনি-ফ্রাঙ্কোচক্র মানবজাতিকে ধ্বংস করার যে ফ্যাসিবাদী কার্যক্রম শুরু করে, সোমেন বিস্ময়করভাবে প্রথম থেকেই ছিলেন তার বিরুদ্ধে। অল্পবয়সে, ভাবতে অবাক লাগে, প্রবীণ রাজনীতিবিদরা যেখানে ভুগেছেন বিভ্রান্তিতে, সোমেন কি করে এই স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছিলেন ? তিনি উদ্যোগী হয়ে সোভিয়েত ইউয়নিয়নের পক্ষে জনমত গড়ার জন্য গঠন করেন 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহ সোমেন-মানসের উজ্জ্বল এলাকা। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ডাকে পৃথিবীর দেশে দেশে অগণিত সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র-স্বাধীনতাকামী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন—অনেকে শহীদ হন। সোমেনও, যিনি আকৈশোর ছিলেন ফ্যাসিবিরোধী যোদ্ধা, ফ্যাসিস্ট-শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট-গুণ্ডাদের হাতে নিহত হন। সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, মানবজাতিকে ফ্যাসিবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য

সোমেনের আত্মত্যাগ তাঁর রাজনীতি-সচেতনতা এবং বিশ্বপ্রসারী জীবন-দৃষ্টির পরিচয়বাহী। বস্তুত, সোমেনের এই বিশ্বপ্রসারী জীবনদৃষ্টিই তাঁর সাহিত্যে নিয়ে এসেছে স্বতন্ত্র এবং সমকাল-লগ্ন মাত্রা।

২

সংক্ষোভময় সমকালে, ১৯৪০-এর দু-তিন বছর পূর্ব থেকেই, বাংলা সাহিত্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণ-লেখক নতুন জীবনবোধে ঋদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হন। প্রথম থেকেই এঁরা ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, থাকে বলে কমিটেড-লেখক। সোমেন চন্দ এঁদের অন্যতম। সাহিত্যের মাধ্যমে এই নতুন লেখকগোষ্ঠী সমাজবদলের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফ্যাসিবাদের ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, পৃথিবীর দেশে দেশে স্বাধীনতাহীনতা-ক্ষুধা-দারিদ্র্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ সংগঠিত হচ্ছে, নতুন সমাজ-নির্মাণের সংগ্রামে এগিয়ে আসছে। সংগ্রামকে সংগঠিত ও ব্যাপক করার দায়িত্ব রাজনৈতিক কর্মীর মতো সাহিত্যিকেরাও উপলব্ধি করলেন, তাঁরা সংগঠিত হলেন। এই পটভূমিতেই বিচার্য সোমেনের সাহিত্যজীবন এবং তাঁর সাহিত্যভাবনা।

সোমেনের অন্বিষ্ট ছিল সাহিত্যে গণশক্তির স্ফূরণ-ঘোষণা। বস্তুত, বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে সাহিত্যসৃষ্টির জন্য সোমেন কিছু লেখেন নি। তাঁর সকল রচনার পশ্চাতেই সংক্রিয় ছিল সমাজের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা—কমিটমেন্ট থেকে তিনি কখনো এক চুল বিচ্যুত হননি। বিপ্লবের জন্য মানুষকে ডাক দেয়া, তাদের মধ্যে চেতনার আলো জ্বেলে দেয়াই সোমেন-সাহিত্যের কেন্দ্রীয় ভাবপরিমণ্ডল। তিনি বিশ্বাস করতেন লেনিনের এই কথা —

> Down with non-partisan writers! Down with literary supermen! Literature must become *part* of the common cause of the proletariat, "a cog and a screw" of one single great Social-Democratic mechanism set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class. Literature must become a component of organised, planned and integrated Social-Democratic Party work.[১৩]

সোমেন চন্দ সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন গণমানবিক উপলব্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশের দশকের বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার উন্মেষ, তিরিশের দশকে তার উত্তরণ ঘটেছিল প্রগতিতে। রাজনীতিচেতনা এই দশকের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, চল্লিশের দশকে যার প্রবল বিস্তৃতি। সোমেন চন্দ, সাহিত্যে এই প্রগতিচেতনা বিকাশের পথিকৃৎ-শিল্পী। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্যই তিনি ধরেছিলেন লেখনী —বস্তুত, বিপ্লবের অনুভূতিই তাঁর রচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। তাই মাত্র আঠার বছর বয়সেই তিনি নির্মলকুমার ঘোষের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

> আপনার চিঠি দেখেছি, 'সবুজ বাংলার কথা'ও পেয়েছি। ভালো লাগলো, আপনার কথাগুলি চমৎকার—তাতে আপনার এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে, বিশেষত—'অর্থনৈতিক পীড়নের দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে কোনো প্রচণ্ড ক্ষোভ—যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভা প্রভাবে এক একদিন আত্মপ্রকাশ করে—নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা,—যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দেবে।' আর 'মানুষের সমাজ গড়ে ওঠবার পর থেকে আজ অবধি প্রায় একই নীতি সর্বদেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে। এর ফলে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক একথা অনস্বীকার্য যে লাভ ও সুবিধার কথা বলতে গেলে আঠারো আনারই মালিকানা জনকয়েক লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে।'—'আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে,—যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার। 'খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। আশীর্বাদ করুন, আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্যসাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।[১৪]

—বিপ্লবের এই উপলব্ধিই সোমেন-সাহিত্যকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। জনসাধারণের মুক্তিসংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে সাহিত্য পালন করতে পারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা—যুদ্ধবিক্ষত বিশ্বপটভূমিতে বেড়ে-ওঠা সোমেনের সাহিত্য-ভাবনার এটাই ছিল মূল কথা। মেহনতী জনতাকে সমগ্র ভাবে জানা, তাদের জীবনসংগ্রাম অধ্যয়ন করা এবং আসন্ন বিপ্লবের জন্য তাদের প্রস্তুত

করার ব্রত নিয়েই সোমেন সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং বিশ্বাস করতেন কেবল এভাবেই একজন লেখক হয়ে উঠতে পারেন প্রকৃত প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সাহিত্যিক।

সাহিত্যের প্রতি আকৈশোর অনুরাগ, ব্যাপক অধ্যয়ন এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পৃক্তি সোমেন-মানসে সৃষ্টিশীল জীবনচেতনা বিকাশের কেন্দ্রীয় উৎস। সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে তিনি রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প লিখতেন, কিন্তু অচিরেই তিনি রোম্যান্টিকতার পথ ছেড়ে জীবনের কঠিন বাস্তবতায় ফিরে আসেন, সাহিত্যকে সমাজবদলের শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ম্যাক্সিম গোর্কি, র‍্যালফ ফক্স এবং ক্রিস্টোফার কডওয়েল ছিলেন তাঁর প্রধান প্রেরণা। এ-প্রসঙ্গে সতীশ পাকড়াশী—যিনি সোমেনকে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়েছেন—যা বলেছেন, তা স্মরণীয়—"মহৎ কর্ম্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথা যায়না। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলন্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক রালফ ফক্সের (Ralph Fox) আত্মদান গণমানবের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।...ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে বসে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাই হচ্ছিল, ...সোমেন জিজ্ঞাসু-ভরা প্রাণে বলে উঠল,—'সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল।' আমি বললাম, অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারি ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নূতন সাহিত্য তৈরী হয়। ধন-শোষণ-মদমত্ত ফ্যাসিস্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্যসাধনায় লাঞ্ছিত গণমানবের মর্ম্মকথা ফুটিয়ে তোলবার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাই লেখককে গণমানবের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ করে শুনে একটু পড়ে বলল, 'এরাই সত্যিকার সাহিত্যিক।' রাত্রিতে আমরা ফিরলাম। সোমেন তার গুটি দুই-তিন লেখক বন্ধুদের নিয়ে নূতন সাহিত্যের কথা বলতে বলতে বাড়ি গেল।"[১৫] সোমেনের অনেক লেখায় গোর্কি-কডওয়েল-ফক্সের লেখার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জীবনার্থের এই আন্তর্জাতিক ঐক্যসূত্রে সোমেন ছিলেন তাঁদের চৈতন্যের সহোদর।

কমিউনিস্ট মতাদর্শ সোমেনের জীবনের যেমন কেন্দ্রীয় সত্য, তেমনি তাঁর সাহিত্যেরও। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল

সাম্প্রদায়িকতাকে আঘাত করতে চেয়েছেন, ভাঙতে চেয়েছেন এই জীর্ণ সমাজ। বস্তুত, কমিনটার্নের বিশ্ববরেণ্য নেতা ডিমিট্রিয়ফের এই বাণী সোমেনের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে-ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল— "Help us, help the party of the working class, the Commintern —give us a keen weapon in artistic form in poetry, novels and short stories —to use in this struggle."[১৬] বন্ধু অমৃতকুমার দত্তের কাছে লেখা চিঠিতে ডিমিট্রিয়ফের এই বক্তব্যই যেন উচ্চারণ করেছেন সোমেন—

> গত কয়েকদিন রেল-শ্রমিকদের নিয়ে বেশ ঝামেলায় ছিলাম। লেখার জন্য একটুও সময় পাইনা। তবু লিখতে হবে, মেহনতী মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য, আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফক্‌সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই না হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায় ? স্পেনের পপুলার ফ্রণ্ট সরকারের সমর্থনে তাঁদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকরা এ-দিকে সচেতন হচ্ছে।...
>
> বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা করো। শৌখীন সাহিত্য করার আর সময় নেই।[১৭]

গণ-মানুষের হার্দিক উত্তাপকে ধারণ করার জন্য সোমেন সচেতনভাবে সময়-সমাজ এবং জীবন থেকে আহরণ করেছেন তাঁর শিল্পের উপকরণ। যে কাললগ্নে, যে বিশ্বপটভূমিতে, যে সর্বগ্রাসী ফ্যাসীবাদী বি-মানবিকতার প্রতিবেশে, যে জীবনধারায় তাঁর চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ, তাঁর সাহিত্য-ভাবনা এবং শিল্পবোধের উৎসমূলেও রয়েছে সেই সময়-সমাজ ও প্রাতিস্বিক জীবনবীক্ষণের প্রগাঢ় উপলব্ধি। নিপীড়িত জীবনের সঙ্গে ছিল তার আত্যন্তিক সংযোগ; শোষিত মানুষের সংক্ষোভ আর সংগ্রামের আগুনে তাঁর হৃদয় ছিল উত্তপ্ত, বিপ্লবস্পন্দিত। গল্প-কবিতা-উপন্যাসের ঘটনাংশ তিনি চয়ন করেছেন এই নিপীড়িত-শোষিত জীবন থেকে। বাংলাদেশের অন্যতম কমিউনিস্ট-সংগঠক অনিল মুখার্জীর স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে সোমেনের সাহিত্যিক-সত্তার এই গৌরবোজ্জ্বল প্রান্ত—"কথা শেষ হইতেই সোমেন আসিয়া হাজির,...। দুই একটা কথা বলিলাম—মনটা চমৎকার

খোলসা, আর কাজে কি উৎসাহ! অচ্যুতবাবু কথায় কথায় বলিলেন,—সারাদিন কাজ করার পর আপনি এত লেখেন কখন, আপনি তো দেখছি অসাধারণ লোক। সোমেন লজ্জিতভাবে বলিল,—কিন্তু সারাদিন রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে না থাকলে আমি আজকাল লিখতে পারিনা। কথাটা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল।"[১৮] ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক সোমেনের সাহিত্যিক-স্বাতন্ত্র্যের কেন্দ্রীয়-উৎস। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে রাজনীতি ও শিল্পকে, পার্বতী-পরমেশ্বরের নিবির ঐকান্তিকতায় মিলিয়ে দিয়েছেন সোমেন চন্দ। এক্ষেত্রে বার বার মনে আসে আর একজন কবির কথা, মাত্র একুশ বছরে যিনি মৃত্যুর গলায় মালা জড়িয়েছেন, সেই সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) কথা, চেতনার দিক থেকে, জীবনার্থের দৃষ্টিকোণে, যিনি যথার্থভাবেই ছিলেন সোমেন চন্দের উত্তরসাধক।

সন্দেহ নেই, সোমেন চন্দের প্রায় সকল রচনার পশ্চাতেই রয়েছে একটি বিশেষ লক্ষ্য—সাহিত্যে সংগ্রামীজীবনের উত্তাপ-ধারণ। উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি হলেও, তাঁর সকল রচনাই সাহিত্যগুণে উজ্জ্বল-মধুর-কালোত্তীর্ণ—'মানসিক আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়েও প্রচারধর্মী রূঢ়তার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[১৯] সোমেনের সতর্ক শিল্পীসত্তা নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর আবেগ আর উদ্দেশ্যে। শৈল্পিক সংযম আর প্রকরণ-পরিচর্যার স্বাতন্ত্র্যে তাঁর সমুদয় সৃষ্টিই সাহিত্যগুণে বিশিষ্ট—শিল্পের মৃত্যু ঘটিয়ে উদ্দেশ্য কোথাও উৎকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। অল্প বয়সেই সার্বিক শিল্পদৃষ্টির অধিকারী হওয়ায় সাম্যবাদী চিন্তা আর বিপ্লবের অনুভূতিকে সোমেন চন্দ ব্যবহার করতে পেরেছেন যথার্থ রসসৃষ্টির কাজে। তিনি জীবন থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, তাই তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায় বিষয়বস্তু ও শিল্প-রীতির বিস্ময়কর সামঞ্জস্য এবং শিল্পিত ভারসাম্য।[২০] এ-প্রসঙ্গে সমালোচক রণেশ দাশগুপ্তের ভাষ্য স্মরণীয়—"গোটা গোটা মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে সোমেন আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয় দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাছ থেকে আমরা যা চাই সেই নির্বাচনক্ষমতা। এই কারণেই সোমেনের আদর্শবাদী নায়করা যখন বিপ্লবের কথা বলেছে, তখন তা যেমন সংযত, তেমনি মাধুর্যময়ী ; নায়িকাদের মনে যে অনুভূতি দোলা দিয়েছে, তখন তা-ও সংযত।'[২১] সোমেন চন্দ, স্বোপার্জিত শিল্পরীতির সহায়-তায় অতিক্রম করে গেছেন স্বকালের অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকের রচনায়

লক্ষ্যযোগ্য ফরমুলাধর্মী মার্কসীয় তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ। অচ্যুত গোস্বামীর মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> সেকালে প্রগতিশীল বাস্তববাদী গল্প বলে যে সব গল্প প্রকাশিত হত সেগুলোর বেশীর ভাগেই থাকত সমাজের যান্ত্রিক বিশ্লেষণ, ফরমুলা মাফিক কাহিনী বিন্যাস এবং ঈশপীয় কাহিনীর মত উপদেশাত্মক এবং পূর্বানুমানযোগ্য পরিসমাপ্তি। সোমেন ঐ অল্প বয়সে প্রগতিশীল ভাবনাত্মক কাহিনীকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজস্ব শিল্পসঙ্গত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। হয়ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে সে এই পদ্ধতির খানিকটা আভাস পেয়েছিল। কিন্তু মূলতঃ এ পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল তার মনে। নিজের জীবনের তীব্র বেদনাদগ্ধ অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয়কে রূপায়িত করার তাগিদে এর জন্ম।[২২]

সমাজচৈতন্য আর ব্যক্তি-সংবেদনার অন্তর্মূল মিথষ্ক্রিয়ায় উৎসারিত হয় সত্যিকারের সাহিত্য—এ-কথা সোমেন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। সমাজের বহির্বাস্তবতা এবং ব্যক্তির অন্তর্বাস্তবতা—উভয় এলাকাতেই ছিল তাঁর সহজ বিচরণ। বস্তুত, কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজজীবনকে, মানুষকে, মানুষের অন্তরলোককে। মানবাত্মার মুক্তিকামনায় তাঁর হৃদয় ছিল আকৈশোর উদ্বেলিত; কমিউনিস্ট মতাদর্শ-গ্রহণ সেই উদ্বেল-অভীপ্সাকে করেছে প্রগাঢ়, প্রাণবান এবং দর্শন-পরিস্রুত। সোমেনের রচনায় মানবাত্মার মুক্তি-কামনা উচচারিত হয়েছে, ধ্বনিত হয়েছে মানবাত্মার বিজয়-গাঁথা। 'লেখকরা হচেছন মানবাত্মার ইঞ্জিনিয়ার'—স্তালিনের এই কথা সোমেনের জীবনে এ-সূত্রেই আরোপ করা যায়। কমিউনিস্ট সোমেন একথা জানতেন এবং প্রগতিশীল সাহিত্যিক হিসেবে বন্ধুদের কাছে মাঝে মাঝে বলতেন : "কমিউনিস্ট হওয়া সহজ ব্যাপার নয়, নানা ধরনের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি হলে তবেই সত্যকারের কমিউনিস্ট হওয়া যায়। একজন মার্কসবাদী লেখক হওয়া আরও কঠিন ব্যাপার। প্রতিটি পদক্ষেপে বিভ্রান্তি দেখা যেতে পারে, যদি-না রচনার মধ্যে ব্যক্তি-সত্তা ও সমাজসত্তার যথাযথ সমন্বয় ঘটে।"[২৩] তখনকার দিনে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা প্রগতিশীল লেখকদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার করতো, কখনো নির্দেশ করতো তাঁদের লেখায় মার্কসবাদের যান্ত্রিক উপস্থিতি-প্রসঙ্গ।

এ-ক্ষেত্রে সোমেন ছিলেন অতি সতর্ক এবং সচেতন। শত্রুকে ন্যূনতম সুযোগ না-দেয়ার জন্য তিনি নিজের জীবনে, আচরণে ও উচ্চারণে এক-জন পুরোপুরি কমিউনিস্ট লেখক হবার সাধনা করেছেন। লেখকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে অল্প বয়স থেকেই ছিল তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের বিভিন্ন সভায় তিনি উচ্চারণ করেছেন সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রগতিশীল লেখকদের এগিয়ে আসার আহ্বান বাণী। সঙ্ঘের সভায় প্রায়ই তিনি বলতেন : "বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল বলে কোনো লেখককে শুধু গালাগাল দিলেই সমস্যার সমাধান হতে পারেনা, একজন প্রগতিশীল লেখককে তার নিজের রচনার মধ্যে দিয়েই দেখিয়ে দিতে হবে কিরকমভাবে একালের ক্ষয়িষ্ণু-সমাজের মধ্য থেকে আগামীকালের সুস্থ ও সুখী জীবনের শক্তিগুলো ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে এবং ভাবীকালের হৃদয়স্পন্দনের সংকেত জানিয়ে দিচ্ছে।"[২৪]

সোমেন চন্দ ছিলেন পরীক্ষাপ্রিয় সাহিত্যশিল্পী। রচনা যাতে প্রচার-ধর্মী না হয়, এ-ব্যাপারে ছিলেন তিনি সদা-সতর্ক। তাঁর গল্প শিল্পের মহিমায় উজ্জ্বল, সেখানে আদর্শ আছে, তবে তা গল্পের অন্তর্স্রোতে প্রবহ-মান। কোন কিছু লিখে তিনি ছাপাতে দিতেন না ; স্ব-সমালোচনার মুখো-মুখি হতেন বারবার। এজন্য তাঁর অনেক গল্পই অপ্রকাশিত থেকেছে। বার্নার্ড শ'-র কৈশোরক লেখার মতোই অনেক রচনাকে তিনি 'non-age' লেখা বলে ফেলে রাখতেন। তাঁর এই মানসদৃষ্টির পরিচয় পাবো নির্মল-কুমার ঘোষ-এর কাছে লেখা এক পত্রে :

> আমি একটা উপন্যাস লিখছি এখন, এবং সেটা শেষ হতে বেশী দেরী নেই। এটা শেষ হলে আগামী ক্রীসমাসে কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আপনি 'নবশক্তি'-র গল্পটার প্রকাশের কথা লিখে-ছেন—ভালো কথা, ওরা আমাকে পারিশ্রমিক দেয়নি—আপনি ওদের দিয়ে সেটা ছাপিয়ে নেয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু আমার নিজের সেই গল্পটা পছন্দ হয়না, বিশেষত প্রথম দিকে ডায়লগগুলি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, অবশ্যি তা বদলানো যেতে পারে—কিন্তু আসল কথা, আমার যা নীতি, তা প্রকাশ পায়নি সেই গল্পে—কাজেই প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয়না।[২৫]

—এই বক্তব্যই সোমেন-সাহিত্যের কেন্দ্রীয়-সত্য। কেবল সাহিত্য নয়, কেবল আদর্শ নয়—দুটোর সম্মিলন ঘটাতেই তাঁর যত সাধনা। Fine doing এবং Fine writing সোমেন চন্দকে, সোমেন-সাহিত্যকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

সোমেন চন্দ বিশ্বাস করতেন রোঁমা রোঁলার এই কথা—'খাঁটি আর্টের নিবেদন এমন গভীর যে, তা নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়েও সাড়া দেয়।'[২৬] নিম্নতম অধিকারীর হৃদয় বা মেহনতী জনতার জন্য সোমেন চন্দ সাহিত্য-চর্চা করেছেন। এক্ষেত্রে কখনো কখনো তাঁর কাছে বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রবল নিপীড়ন, কখনো-বা ধনী প্রকাশক। 'বন্যা' উপন্যাসের প্লট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, এক পত্রে সোমেন চন্দ এ-কথা প্রকাশ করেছেন, যাতে ধরা পড়েছে তাঁর মানস-দৃষ্টি এবং কেন্দ্রস্থ আকাঙ্ক্ষা—"রজতের Ideology প্রচার করতে গিয়ে অনেকখানেই আমাকে চেপে যেতে হয়েছে, পুরোপুরি খোলা হতে পারিনি; এইখানেই একটা কথা আমার বার-বার মনে হয়েছে, সেটা এই, দেশে যদি চারপাশে এমনি নাগপাশের বাঁধন না থাকতো, অর্থাৎ দেশে যদি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট থাকতো তবে আমাদের বিশেষভাবে উপন্যাস-সাহিত্যের গতি এই যে রুদ্ধ হয়ে এসেছে, তার বাঁধন খুলতো। বৃহত্তর চিন্তা আমরা কি কম করি, মার্কস-হেগেল-কোল-স্টাচি-শ'-কি অনেকেরই কণ্ঠস্থ নয়? কিন্তু আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত, দুঃখক্লিষ্ট জীবনে বৃহত্তর চিন্তাকে মিশ খাইয়ে একটু আশার বাণী শোনায় কে? ক্যাপিটালিজম আর ইম্পিরিয়ালিজম-এ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, প্রথমটির বিরুদ্ধে কোন লেখকের অভিযান করতে হলে দ্বিতীয়টির বিরুদ্ধেও করতে হয়...।"[২৭] ক্যাপিটালিজম আর ইম্পিরিয়ালিজম-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্যবাদের জন্য সংগ্রাম সোমেন-জীবনের যেমন কেন্দ্রীয় সত্য, তেমনি তা-ই সোমেন-সাহিত্যের মৌল-প্রত্যয়।

৩

সোমেন চন্দের রাজনীতি-চিন্তা ও সাহিত্যভাবনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—তাঁর জীবনাচরণে ও সৃষ্টিতে একাত্ম হয়ে গেছে উভয়-প্রান্ত। রাজনীতি-সম্পৃক্তি, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে আন্তরিক সংযোগ এবং প্রগতি-শীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত আছে সোমেন চন্দের সুগভীর জীবনবোধ ও শিল্পজিজ্ঞাসার কেন্দ্রীয় সত্য। তিনি কেবল

সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবনের সৈনিক। সাহিত্যকে জীবন ও রাজনীতি থেকে তিনি কখনো আলাদা করে দেখেননি। জীবনার্থ এবং শিল্পজিজ্ঞাসার স্বাতন্ত্র্যে সোমেন চন্দ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক—একথা অনস্বীকার্য।

উৎস-নির্দেশ

১ সোমেন চন্দের বিস্তৃত জীবনের জন্য দ্রষ্টব্য :

ক. দিলীপ মজুমদার (সম্পাদক) : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা ; ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৭, পূর্বোক্ত।

খ. রণেশ দাশগুপ্ত (সম্পাদক) : সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ (ভূমিকাংশ), ১৯৭৩, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা।

গ. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : "সোমেন চন্দ ও সমকাল", 'সাহিত্যচিন্তা' (সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত), ১০ম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা (সোমেন চন্দ স্মরণ সংখ্যা), এপ্রিল ১৯৮১, কলকাতা।

ঘ. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (সম্পাদক) : সোমেন চন্দের সুনির্বাচিত গল্প (ভূমিকাংশ), ১৯৮৩, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা।

ঙ. বিশ্বজিৎ ঘোষ : "সোমেন চন্দের জীবন ও প্রসঙ্গ-কথা", 'সাহিত্য পত্রিকা' (সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), ঊনত্রিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

চ. হায়াৎ মামুদ : সোমেন চন্দ, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২ সরদার ফজলুল করিম : নানাকথা, ১৯৭২, বর্ণমিছিল, ঢাকা, পৃ. ৯২

৩ দ্রষ্টব্য : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫-৭৬

৪ সোমেন চন্দ : 'ইঁদুর', সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১-২২

৫ সোমেন চন্দ : 'একটি রাত', সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২-৭৩

৬ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", 'এষা', ৪র্থ বর্ষ : ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭৬। উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮৩

৭ পূর্বোক্ত।

৮ দ্রষ্টব্য : বিশ্বজিৎ ঘোষ : "সোমেন চন্দ : পত্রগুচ্ছ", 'সাহিত্য পত্রিকা'' পূর্বোক্ত, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১৪৪

৯ রণেশ দাশগুপ্ত : "বাংলা ছোটগল্পের সুকান্ত—সোমেন চন্দ", 'গণসাহিত্য' (সম্পাদক : আবুল হাসনাত, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মফিদুল হক), প্রথম বর্ষ : ৮ম-৯বম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৩, ঢাকা, পৃ. ৬৫-৬৬

১০ রণেশ দাশগুপ্ত : আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ, ১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২০৯

১১ সোমেন চন্দ : 'দাঙ্গা', সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮-৯৯

১২ ঐ, পৃ. ২০২-০৩

১৩ V. I. Lenin : On Literature and Art, 1970, Progress Publishers, Moscow, p. 23

১৪ দ্রষ্টব্য : বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

১৫ সতীশ পাকড়াশী : "সোমেন চন্দ", অগ্নিযুগের কথা, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭৮, পৃ. ২৫৪-৫৫

১৬ J. Dimitrov : Complete works, Vol. 1, 1968, Progress publishers, Moscow, p. 170

১৭ দ্রষ্টব্য : বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২-৫৩

১৮ দ্রষ্টব্য : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২৭৭

১৯ ক্ষুদিরাম দাস, "গল্পকার সোমেন", 'সাহিত্যচিন্তা' (সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২০ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : "সোমেন চন্দ ও সমকাল", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

২১ রণেশ দাশগুপ্ত : "বাংলা ছোটগল্পের সুকান্ত—সোমেন চন্দ", 'গণসাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

২২ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০-৯১

২৩ দ্রষ্টব্য : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০-৪১

২৪ ঐ, পৃ. ৩৪২

২৫ দ্রষ্টব্য : বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫